প্রত্যাবর্তন

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি

কাকিমা তাহাকে 'গবাক্ষ' বলিয়াই ডাকিতেন। গোবিন্দ নামটি উচ্চারণ করিতে তাঁহার নাকি কষ্ট হইত, তাই তিনি শব্দটিকে সরল করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, কি বিদঘুটে নাম বাপু! বেছে বেছে নাম রেখেছেন গো-বি-ন্দ। উচ্চারণ করতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। ভেবেছেন ওই নামে ডেকে বুঝি ভবনদী পার হয়ে যাবেন! মরে যাই আশা দেখে।

আর মাস্টারেরা তাহার নাম দিয়াছিলেন 'গোবরা', কেননা বুদ্ধি বলিয়াই নাকি কোনো পদার্থ হতভাগার মাথায় ছিল না। তাহার সারা মাথাটি নাকি গোবরে ভরিয়া ছিল। মাস্টারদের শিক্ষাগুণে আর সকলেই তাহাকে 'গোবরা' বলিতেই শিখিয়াছিল।

সেদিন বিকালে স্কুল হইতে ফিরিয়াই তাহার কাকার ছোট ছেলে চিৎকার করিয়া উঠিল, মা, গোবরা আজ ভয়ানক মার খেয়েছে!

বয়সে সে গোবিন্দের চেয়ে তিন বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সে দ্বিধা বোধ করিত। কাকিমা হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? দুশো বার বলেছিলুম, হতভাগাটাকে ইস্কুলে ভর্তি করে কাজ নেই, তবু যদি এ অভাগীর কথা শুনবে! মাগী মরুক চেঁচিয়ে, ওনার বয়ে গেছে। কথা আছে না, কানে দিয়েছে তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো। ওনারও সেই দশা হয়েছে। কেন মার খেয়েছে রে সেন্টু।

সেন্টু সগৌরবে কহিল, পড়া পারে নি মা। কোনো দিনও পড়া পারে না।

সেন্টু ও গোবিন্দ এক ক্লাসে পড়ে।

কাকিমা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, গবাক্ষ, এদিকে আয়।

বলির পশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে গবাক্ষ কাকিমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কাকিমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, পড়া পারিস নে কেন রে গবাক্ষ? টাকাগুলো কি খোলামকুচি পেয়েছিস? ইস্কুলের মাইনে, বাড়ির মাস্টারের মাইনে, আমাদের কি তালুক-মুলুক আছে বাছা? হ্যাঁ, যদি বুঝতুম কিছু হচ্ছেতা হলে নয় এক কথা। তা নয়, এ শুধু ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!

সেন্টু কহিল, পিঠে বেতের দাগ বসে গেছে মা। জামা তুলে দেখ।

কাকিমা জামা তুলিয়া দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে রায় প্রকাশ করিলেন, আচ্ছা, উনি আসুন আগে বাড়ি।

এ মকদ্দমা যেন দায়রায় সোপর্দ হইল।

গোবিন্দ পড়া পারে না সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে একটি অতি সত্য নিহিত ছিল। বাড়িতে সে পড়িবার সময় পায় না। সারাদিন কাকিমার ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকিত না। না বলিবার জো নাই। তাহা হইলে হয়তোবাড়ি হইতে দূর করিয়াই দিবেন তৎক্ষণাৎ। প্রায়ই তো তিনি বলেন, বিদি হয়ে যা, বিদি হয়ে যা; আর জ্বালাতন করিস নে আমাদের। মাগী একটা ফ্যাচাং দিয়েছে দেখ না!

সেদিন সকালবেলা সবে পড়িতে বসিয়াছে এমন সময়ে কাকিমা আসিয়া তাহাকে একটি আনি দিয়া বলিলেন, ওরে গবাক্ষ, চট করে দু'পয়সার চিনি নিয়ে আয় তো। দয়া করে দুটো পয়সা ফিরিয়ে আনতে ভুলিস না যেন। তোর আবার যে ভুলো মন।

গবাক্ষ তখন বাঙলা দেশে কয়টি বিভাগ আছে মুখস্থ করিতে ব্যস্ত। পড়া না করিলে সতীশবাবু তাহাকে মারিয়া রসাতল করিবেন। আশ্চর্য এই সতীশবাবু! গাঁট্টা মারিতে তিনি অত্যন্ত পটু। প্রথম দিন হইতে তিনি গবাক্ষকে চিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমেই তিনি চোখ বুজিয়াই ডাকিয়া বসেন, গোবরা, এদিকে আয়।

ওই ডাক শুনিয়াই গোবিন্দর রক্ত শুকাইয়া যায়। তারপর তিনি হয়তো প্রশ্ন করিলেন, বল বাঙলা দেশের রাজধানী কি? আর সেখানে কি কি দেখবার জিনিস আছে?

এই ভূগোল পড়াটা তাহার কোনদিনই হয় না। সতীশবাবু বলেন, তুই কি প্রতিজ্ঞা করেছিস পড়বি না? ছেড়ে দে বাপ, ছেড়ে দে।

ভূগোল পড়িবার কথা সকালে, আর প্রতিদিন সকালে তাহার কোনো না কোনো ব্যাঘাত ঘটিবেই ঘটিবে। সেদিন সে ভূগোল পড়িবার দুর্জয় পণ করিয়া বসিয়াছিল। কাকিমার আনিটা মাটিতে রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল, রাজসাহী, চট্টগ্রাম...

এমন সময় নীচ হইতে কাকিমা গর্জন করিয়া উঠিলেন, ওরে ও বিদ্যাসাগর, আর জজ ম্যাজিস্টার হস্‌নে। এদিকে চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে রে।

অগত্যা তাহাকে বইখাতা গুটাইয়া উঠিতে হইল। চিনি আনিয়াই কিন্তু সে নিষ্কৃতি পাইল না। চিনির পর তাহাকে বাজার যাইতে হইল। কাকিমা বলিলেন, এক পয়সার পলতা আনিস দিকিনি, আলু দেখে কিনবি, কালকের মত যেন পোকা না থাকে, আর গুচ্ছের পাকা ঢ্যাঁড়স আনিস নে যেন, বুঝলি?

বাজার করিয়া ফিরিতেই তাহার বেলা নয়টা হইয়া গেল। কাকিমা হিসাব নিলেন। চারটি পয়সা কম পড়িল। কাকিমা চোখ পাকাইলেন, বলিলেন, বার কর বলছি পয়সা।

গোবিন্দ কহিল, আর তো কোনো পয়সা ফেরে নি কাকিমা।

কাকিমা বলিলেন, আর মিছে কথা বলিস নে রে গবাক্ষ। হিসেব শেখাচ্ছিস তুই আমায়? বাজারের পয়সা চুরি! ওমা, আমি কোথায় যাব! বাড়তে বাড়তে তুই যে বেড়ে উঠেছিস! না, আজ আর তোর নিস্তার নেই, ডাক তোর কাকাকে।

গবাক্ষকে আর ডাকিতে হইল না, সেন্টুই তাহার হইয়া কাজটি করিয়া দিল। কাকিমা বলিলেন, ওগো, দেখ তোমার গুণমণির কীর্তি। ডানা উঠেছে। চুরি শিখেছে। চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা! আজ বাজারের পয়সা চুরি করবে, কাল বাক্স ভাঙবে, পরশু সিন্দুক ভাঙবে। এখন হয়েছে কি! আদরের ভাইপো তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। দোষ যে আমার!

কাকা নিজে হিসাব লইলেন। তথাপি সেই চারিটি পয়সা কম পড়িল। শত চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দ ওই চারিটি পয়সার হিসাব দিতে পারিল না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কাকা সহ্য করিয়া করিয়া সেই চরম সীমায় সেদিন পৌঁছিলেন। তিনি অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে অতিরিক্ত রাগিয়া উঠিলেন। তিনি উকিল। আজ দীর্ঘ বার বছর ধরিয়া স্থিরভাবে ছোট আদালতে প্র্যাক্টিস করিয়াছেন। চুরি জিনিসটার উপর তাঁহার দৃষ্টি সচরাচর সহজেই নিবদ্ধ হয়। তিনি গোবিন্দকে গুটিকয়েক জেরা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন, সে পয়সা চারিটি আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। রাগিলে তিনি ভীষণ হইয়া ওঠেন। তিনি বলিলেন, দেখি তোর ট্যাঁক!

অগত্যা তাহার ট্যাঁক দেখা হইল, কিন্তু পয়সা সেখানে পাওয়া গেল না। তখন কাকিমা হাসিয়া বলিলেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর? বলিহারি যাই! ও এত বোকা যে পয়সা তোমার জন্যে ট্যাঁকে রেখে দেবে, না?

কথা শেষে তিনি হাসিলেন, কাকা আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, দুম্‌দাম করিয়া তাহাকে প্রহার শুরু করিয়া দিলেন। কাকার নিকট গোবিন্দ এই প্রথম মার খাইল। কাকাই যা এতদিন তাহাকে সুনজরে দেখিতেন, আজ তিনিও তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তিনি চিৎকার করিলেন, হারামজাদার জন্যে দুশো দিন আমায় কথা শুনতে হবে! দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা। দুধকলা দিয়ে আমি যেন কালসাপ পুষেছি। দূর করে দিয়ে তবে ছাড়ব।

এ চিৎকার করিতে করিতেই তিনি অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিলেন। কাকিমা বকিয়া চলিলেন, দোষ দাও যে আমায়, দেখ এবার ভাইপোর গুণ! গোড়াতেই আমি বলেছিলুম, ওসব ঝঞ্ঝাট পুষো না—পুষো না। তখন যদি এ দাসীবাদীর কথা শোন! মনে রেখো, গরিবের কথা বাসী হলে খাটে।

পরিশেষে কাকা প্রহার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ কিন্তু কাঁদিল না। মারিয়া কাটিয়া ফেলিলেও গোবিন্দ নাকি কাঁদে না। ইহা তাহার ছেলেবেলাকার অভ্যাস। তথাপি সেদিন কিন্তু তাহার মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া গেল। কলিকাতা তাহার নিকট ভাল লাগে না। প্রথম যেদিন তাহার বিধবা মা তাহার কাকাকে কহিলেন, ঠাকুরপো, এখেনে বসে থেকে থেকে তো গোবিন্দ দিন দিন গোল্লায় যাচ্চে, তুমি যদি নিয়ে যাও তোমার ওখেনে তাহলে ভারী ভাল হয় ভাই। তোমার সেন্টু মেন্টুর সঙ্গে ও একটু তাহলে পড়তে পারে। নইলে ওকে এই এতটুকু বয়সেই লেখাপড়া ছাড়াতে হয়। কি করব বল, পেটে খেতে পাই না, তা আবার ছেলেকে বোর্ডিঙে রেখে লেখাপড়া শেখাব! তবে তুমি যদি দয়া কর তা আলাদা কথা।

কাকা রাজি হইয়া গেলেন। গোবিন্দ যেন সেদিন হাতে স্বর্গ পাইল। কলিকাতা তাহার শিশুকালের স্বপ্ন। এই তীর্থস্থান দেখিবার জন্য শিশুকাল হইতে তাহার মনে অদম্য পিপাসা জাগিয়াছে। সেই স্বপ্ন তাহার সফল হইবে। বেশ মনে আছে, সেদিন সে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইয়াছিল। সারাদিন গ্রামময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পরমসৌভাগ্যের কথা ঘোষণা করিয়া মরিয়াছিল। নিঃশব্দে মধ্যাহ্নে ছিপ হাতে সোনাদিঘির পাড়ে বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে তাহার সেই কলিকাতার কথা মনে পড়িল। সেই বুড়ো ফণি-মনসার গাছটি তাহার নিকট তখন অতিসুন্দর বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে যেন নূতন করিয়া রঙীন কাচের মধ্য দিয়া দিয়া দেখিতে লাগিল। দিঘির ধারে অসংখ্য তালগাছ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাতাস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জলের উপর একটি স্পন্দন পর্যন্ত ছিল না। ওপাশে সারি বাঁধিয়া পদ্ম ফুটিয়া ছিল। পদ্মের পাতায় দিঘির কালো জল ঢাকিয়া গিয়াছিল। দিঘির ধার দিয়া দুটি পাতিহাঁস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। দূরে একটি কাঠঠোকরা অবিরত ঠক্ ঠক্ করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল। সেদিন সেই বনশোভা দেখিয়া গোবিন্দের চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তাহার ফাৎনা ডুবিয়াছে কি ভাসিতেছে, তাহার ছিপে টান পড়িল কিনা সেদিকে তাহার হুঁশ ছিল না। সে পরক্ষণেই কাপড় দিয়া তাহার অবোধ অশ্রুকণাগুলি চুপি চুপি মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার শহরে যাওয়ার আনন্দ তাহার গ্রাম ত্যাগের দুঃখের চেয়ে গভীর হইয়াছিল।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহার দীর্ঘদিনের মধুর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহার মনোরাজ্যের কলিকাতাকে সে ফিরিয়া পাইল না। এখানে আকাশ নাই, বাতাস নাই, সবুজ ঘাস নাই, সন্ধ্যার সূর্যের অগণিত রঙের খেলা নাই। এখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না। মানুষ মানুষকে হিংসা করে, ঘৃণা করে। এখানে আছে কেবল ‘পড়’ ‘পড়’। উঠিতে বসিতে সর্বক্ষণ সে শুনিতেছে ‘পড়’ ‘পড়’। পড়ার যূপকাষ্ঠে এখানকার সকলেই বলিপ্রদত্ত। এখানকার পাঁচিলঘেরা ক্ষুদ্রপরিসর গৃহকোণে পড়িয়া থাকিয়া বন্দীজীবন কাটাইতে সে সহসা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার স্থান এখানে নাই। কলিকাতা তাহার নিকট কারাগার বোধ হইল।

সেদিন স্কুলে গিয়া সে তলাইয়া তলাইয়া অতীতকে দেখিতে লাগিল। সকলেই তাহাকে দূর করিবার জন্য উন্মুখ। এখানে তাহার ঠাঁই নাই। কিন্তু সে পয়সা চুরি করে নাই, আলুওয়ালাই তাহাকে ঠকাইয়া চারিটি পয়সা লইয়াছে। তাহার স্পষ্টবাদী কাকিমার কাছে এই মারাত্মক সত্য স্বীকার করিতে তাহার সাহস হয় নাই। তাই তাহাকে মিথ্যা মার খাইতে হইল। তারপর স্কুলে সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, বাঙলা দেশে কটা জেলা?

গোবিন্দের মুখে কোনো কথা সরিল না। ইতিমধ্যে সে তাহার পাঠ রীতিমত ভুলিয়া গিয়াছে। ভূগোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। তাহার ফলস্বরূপ সতীশবাবু তাহার পিঠে দাগ বসাইয়া দিতে ভোলেন নাই। গোবিন্দকে তিনি গাঁট্টা মারিয়া মারিয়া কাহিল হইয়া গিয়াছিলেন। সে কাঁদে নাই। অগত্যা তিনি সেদিন তাঁহার বিখ্যাত গাঁট্টার পরিবর্তে ম্যাপে দেখাইবার লাঠিটা ব্যবহার করিলেন। আরও বলিলেন, ছেড়ে দে বাবা, আমাদের ছেড়ে দে, দেশে গিয়ে চাষবাস করগে!

বাড়িতে ফিরিতেই কাকিমা তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন, মানিক আমার, সোনা আমার, এস। লিখে পড়ে এসেছ, একবাটি দুধু খাও!

সেই প্রথম গোবিন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, আমি খাব না।

কাকিমাও বলিলেন, ও বাবা! কুলোপানা চক্কর! না খাবি তো আমার ভারি বয়ে গেছে। আমার সাধবার গরজ!

কাকিমা সাধিলেন না, গোবিন্দও খাইতে চাহিল না। সে চুপি চুপি চিলেকুঠিতে উঠিয়া গেল। চারিদিক নিঃশব্দ। সন্ধ্যা তখন ঘনীভূত হইয়াছিল। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। আকাশের এককোণে একফালি চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে একটি বৃহদাকার নক্ষত্র ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। দক্ষিণের উদাস বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। গোবিন্দর অনেক কথাই মনে পড়িল। ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কাহিনীই তাঁহার স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া উঠিতে লাগিল। সুখ দুঃখ মিশ্রিত কত ক্ষণস্থায়ী দিনের মনোরম ইতিহাস। দূরান্তর হইতে সেই গ্রামের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই পাকা সোনার ধানক্ষেত...নিস্তব্ধসোনাদিঘি, আশেপাশে তালের বন, সবুজ বাঁশের ঝাড়, হলদে পাতায় ভরা বনপথ, মর্মর শব্দ, হাস্যোজ্জ্বল শিমুল গাছ, চিক্কন পত্রশোভিত তেঁতুল গাছ, সব কিছু মিলিয়া তাহার নিকট অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সেই যে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময় পথের ধারের কলকে ফুল হইতে মধু চুষিয়া খাইত সেটিই যেন আজ তাহার নিকট বড় প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। তাহার সোনার দেশ, সোনার মাটি। ইছামতীর ধীর কলধ্বনি, দু-একখানি জেলেডিঙি, সন্ধ্যায় কম্পমান জলের উপর সহস্র সূর্যমূর্তি, নিঃশব্দ প্রকৃতি তাহার নিকট বড়ই মধুর বোধ হইল। তাহার মা'র কথা মনে পড়িল, সেই স্নেহময়ী জননী। দুঃখিনী কত আশা করিয়াই না তাহাকে শহরে পাঠাইয়াছিলেন! যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতেন শহর কি বিষাক্ত, কি বিশ্রী, কি বিস্বাদ! মা'র কথা মনে পড়িতেই গোবিন্দ কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু আর সে রোধ করিতে পারিল না। আজ তাহার জন্মদিন। ভাদ্র মাসে এক শুক্রবারে তাহার জন্ম। এই দিন মা তাহাকে পরমান্ন রাঁধিয়া দেন, খাইবার সময়ে তাহার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়া দেন, শাঁখ বাজান। আজ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন। ভাদ্র মাসের এই শেষ শুক্রবার। এ বৎসর তাহার জন্মদিন বৃথাই কাটিল। কতদিন সে তার মা'র সংবাদ পায় নাই। তিনি কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য তাহার মন সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় পড়িবার সময় তাহার অতিবাহিত হইতেছে, না, সে আজ আর পড়িতে যাইবে না। সেই তো ছোট ঘরখানিতে বসিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতে হইবে। এতটুকু থামিবার অবকাশ নাই, তাহা হইলে মাস্টারের শাসনদণ্ড। সেই বিশ্রী ট্রান্সলেশন, সেই উৎকট গ্রামারের কসরৎ। এসব কিছু তাহার ভাল লাগে না। না, সে লেখাপড়া শিখিতে চায় না। এইরূপ কত কিআকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে কখন সে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল তাহার হুঁশ নাই, সে স্বপ্ন দেখিল, সে যেন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার মা যেন বকিতেছেন, কেন এলি?বেশ তো ছিলি?

তিনি জানেন না তো তাহার ছেলে কি সুখে আছে। জানিলে তিনি নিশ্চয়গোবিন্দকে এই মরুভূমিতে পাঠাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহার যখন ঘুম ভাঙিল তখন কত রাত্রি তাহা বুঝিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বুঝিল, রাত্রি গভীর হইয়াছে। সকলেই যে যার গৃহে নিঃশব্দে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে কেহই পড়িতে বা খাইতে ডাকে নাই। না কাকা না কাকি। এমন সময়ে নিকটের গীর্জার ঘড়িতে সুর করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। গোবিন্দ তাহার চক্ষু মুছিল। ওঃ, রাত্রি তো ভোর হল প্রায়! এই পাঁচটার পর ছয়টায় তাহাদের দেশের একটি ট্রেন আছে। বাড়ির কথা মনে পড়িতেই সে সহসা উঠিয়া বসিল। না, সে আর এখানে থাকিবে না। সে এই ছয়টার গাড়িতেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। চুপিচুপি তাহার ছোট ক্যাশ-বাক্সটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আসিবার সময়ে এই বাক্সটি তাহাকে তাহার মা দিয়াছিলেন।

সে যখন বাড়ি পৌঁছিল তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে খররৌদ্র পড়িয়াছিল। ভোরবেলা হয়তো একপশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। একটি রাখাল বালক বটের ঝুরি ধরিয়া নিবিড় আরামে দোল খাইতেছিল। পাশ দিয়া একটি গরুর গাড়ি চাকার শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দুটি শালিকপাখি ডাকাডাকি করিয়া মাঠের উপর লুকোচুরি খেলিতে লাগিল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল তাহার মা উনানে আগুন দিতেছেন। ফুঁ দিয়া দিয়া তাহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। অজস্রধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি অকস্মাৎ গোবিন্দকেদেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে, চলে এলি যে বড়!

গোবিন্দ মা'র বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিল। তারপর বলিল,তোমায় ছেড়ে আমি আর কখ্‌খনো সেখানে যাব না।

মা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তাই হবে বাবা। আমি আর তোমায় কাছছাড়া করছি না। এ কি হয়েছে চেহারার ছিরি!

গোবিন্দ একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার মুখ দিয়া আর কোনো কথা সরিল না।